বি শ্ব কা প

এশিয়ায় গর্ব

বিশ্বকাপের আগে নাকাতা ছিলেন তারকা। কিন্তু এখন তারকা ইনামোতো

লিখেছেন **হোসেন সাদ্দাম**

বিশ্ববাসী অবকা হয়ে দেখেছে গ্যালারির কোরিয়ানদের

দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান এবারের বিশ্বকাপের দু'টি স্বাগতিক দেশ ফিফার নতুন নিয়মের আওতায় পড়ে বুসানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ড্র'য়ে সেরা ৮ দলের অন্যতম হবার বিরলতম সুযোগটি লাভ করে। বিরলতম এ কারণে যে, ফিফার আরেকটি নতুন সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী বিশ্বকাপগুলো একে একে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বের অন্য মহাদেশগুলোতে। তাই যদি না আর পারফরমেন্সের জোর থাকে তবে কমপক্ষে আগামী দেড় দশকের মধ্যে আর এরকম শীর্ষ বাছাই হবার সৌভাগ্য হবে না এশিয়ার দেশগুলোর। তবে এবারের বিশ্বকাপের ধারাবাহিকতায় বলতে গেলে বলতেই হয় যে, ঐ পারফরমেন্সের জোরটা হয়তো এসেই যাচ্ছে এশিয়ানদের কপালে যদি না আবারও '৯৪ ও তৎপরবর্তী বিশ্বকাপে সৌদিদের পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সে যাই হোক, এবারের 'স্বাগতিক' জোরে গ্রুপ ডি ও এইচের প্রথম দল হবার মর্যাদা পেয়েছিল কোরিয়া ও জাপান। তারপরে কি হল? ফিফার প্রতি সম্মান জানাতেই হোক বা স্বাগতিকতার বরাত জোরেই হোক বা গ্রুপগুলোর প্রথম দল হবার মর্যাদা রক্ষার্থেই

অঙ্কের হিসাব

বাংলাদেশ জিতবে বিশ্বকাপ ৩৯৬৪ সালে!

হেডলাইনটি পড়ে যে কোনো পাঠক প্রথমেই খুঁজে বের করবেন লেখককে। ভাববেন একজন বদ্ধ উন্মাদের 'উর্বর' মস্তিষ্কের প্রসব এই উদ্ভট কল্পনা। পাঠকের ভাবনাটা অবশ্য যৌক্তিক। ফিফা র‍্যাংকিং-এ যে দেশের অবস্থান শেষ পঞ্চাশে, ফেডারেশনের দুর্নীতির জন্য যাদের বহিষ্কৃত হতে হয় ফিফা থেকে, দু'চার বছরে একবার করে অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল লীগ– তারা কিনা জিতবে বিশ্বকাপ! গত ২৭ এপ্রিল ঢাকা ঘুরে যাওয়া বিশ্বকাপের রেপ্লিকা নয়, মূল ট্রফিই জয় করে নিয়ে আসবে এদেশের দামাল ছেলেরা। অবিশ্বাস্য হলেও একটি সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে এমনটি সম্ভব। আর সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে ৩৯৬৪ সাল পর্যন্ত। সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সে বিশ্বকাপটা হতে পারে আমাদের।

বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও পশ্চিম জার্মানিকে নিয়েই এ বিশ্লেষণ। ব্রাজিল সর্বশেষ বিশ্বকাপ জিতেছে ১৯৯৪ সালে। তার আগে ১৯৭০ সালে। ১৯৯৪ ও ১৯৭০ সংখ্যা দুটির যোগফল ৩৯৬৪। আর্জেন্টিনা সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপ জিতেছে ১৯৮৬ ও ১৯৭৮ সালে। এ সংখ্যা দুটির যোগফলও ৩৯৬৪। একই কথা বলা যায় পশ্চিম জার্মানির ক্ষেত্রেও। ১৯৯০ ও ১৯৭৪ সালে শেষ দু'বার তারা বিশ্বকাপ জয় করে। কাকতালীয়ভাবে এ দুটি সংখ্যার যোগফলও ৩৯৬৪। কোরিয়া-জাপানে বসেছে বিশ্বকাপের ১৭তম আসর ২০০২ সালে। ৩৯৬৪ থেকে ২০০২ বিয়োগ করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ১৯৬২। সেবার দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছিলো ব্রাজিল। সে অনুযায়ী এশিয়া থেকে এবারও বিশ্বকাপ নিচ্ছে তারা। আর ব্রাজিল ব্যতীত অন্য কোনো দেশ নিজেদের মহাদেশের বাইরে থেকে কাপ জয় করে আনতে পারেনি। সেক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা ব্রাজিলের দিকে আরো হেলে পড়ছে। এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছে সাতটি দেশ। উরুগুয়ে, ইটালি, পশ্চিম জার্মানি, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। ফিফার সদস্যভুক্ত বাকি দুই শতাধিক দেশ শিরোপাশূন্য। ৩৯৬৪ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপগুলোতে শিরোপাজয়ী হিসেবে নাম লেখাবে আরো কিছু দেশ। কিন্তু বাকি যারা থাকবে, তারা সবাই আশাবাদী। সে হিসেবে স্বপ্ন দেখতে পারি আমরাও। আলফাজের উত্তরসূরির হাতেই শোভা পাবে ৩৯৬৪ সালের বিশ্বকাপ।

– নোমান মোহাম্মদ

হোক, জাপান ও কোরিয়া এবারে উঠল বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে এবং তাও আবার গ্রুপের সেরা দল হয়ে। কোরিয়া দুই 'প'- পর্তুগাল, পোল্যান্ডকে হারিয়ে আর জাপান দুই 'ইয়া' রাশিয়া, তিউনিসিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে এখন মুখোমুখি ইটালি-তুরস্কের।

কিন্তু এই অসাধারণ উত্থানের পেছনের কাহিনী কি? কাহিনী সংগ্রামের, সাধনার, সদিচ্ছার আর সঠিক পদক্ষেপের। জাপানের কথাই ধরুন। সাফল্য কি ছিল বিশ্বকাপের আগে? ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপের আগে ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়। তারপর '৯৮-এ বিশ্বকাপে অভিষেক। অভিষেক আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়ার কাছে ১-০ এবং জ্যামাইকার কাছে ২-১ গোলে পরাজয়। সেখানেই তাদের পক্ষে বিশ্বকাপে প্রথম গোল করেন নাকায়ামা। এরপর দলের দায়িত্ব নিলেন ফরাসি কোচ ফিলিপ্পো ট্রুসিয়ের ১৯৯৮-এর সেপ্টেম্বরে। যখন তিনি দলের দায়িত্ব নেন তখন দলটা ছিল ভাঙাচোরা একটি দল। পরাজয় যাদের নিয়মিত ফল, জয় অধরা স্বপ্ন। এমন দেশের জন্য অমন কোচের নিযুক্তিও প্রশ্নাতীত ছিল না। '৯৮-এর বিশ্বকাপে দ. আফ্রিকাকে বিশ্বকাপে আনা কোচের ওপর ভরসা রাখতে ঠিক যেন মন চাইছিল না জাপানি ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। কিন্তু ভুল করেননি জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা। হিসেবি অর্থনীতির ধারক-বাহক জাপানের ফুটবলকর্তাদের মাথার হিসাবও যথেষ্ট সুদূরপ্রসারি ছিল, তার প্রমাণ এবারের বিশ্বকাপে তাদের অসাধারণ পারফরমেন্স।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে শুরু হয় জাপানের পেশাদার ফুটবল লীগের পরিপূর্ণ পথ চলা। বেশ ক'জন ব্রাজিলীয় ফুটবল তারকার বাতলে দেয়া পথ ধরে চলতে থাকে জে. লীগের অগ্রগমন। ব্রাজিলের তারকা খেলোয়াড় জিকোর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেখানে সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করে কাশিমা অ্যান্টলার্স। টয়োটা মোটরস-এর আর্থিক সহায়তাপুষ্ট দল নাগেয়া গ্রাম্পাস ফরাসি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারকে এনে শুরু করে সাফল্যের পথচলা। এভাবেই জে. লীগের পেশাদার দলগুলো দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে বিদেশী খেলোয়াড়-কোচদের এনে বাড়াতে থাকে খেলার ধার-মান। সেই সঙ্গে চলতে থাকে তৃণমূল পর্যায়ে খেলোয়াড়দের তৈরি করার কাজ। গড়ে ওঠে অসংখ্য ফুটবল স্কুল, যার দায়িত্বে আনা হচ্ছে বিখ্যাত সব সাবেক তারকা খেলোয়াড়দের, যাদের খেলোয়াড়ি অভিজ্ঞতা, স্কিল ও চিন্তা-ভাবনা আর সেই সঙ্গে জাপানিদের সংগঠন সাফল্য সৃষ্টি করছে কাজুইওশি, মিউরা, কুনিশিজ কামামুটু, হিদোতেশি নাকাতা, জুনিচিরো ইনামোতো'র মতো খেলোয়াড়দের। এমনই এক অবস্থায় দলের দায়িত্বে পেলেন ট্রুসিয়ের। যখন প্রতিভা আছে কিন্তু নেই সেই প্রতিভার যথাযোগ্য ব্যবহার প্রকৃত পরিকল্পনামাফিক পথে, যে পথে আসতে পারে আন্তর্জাতিক সাফল্য। এর কারণ ছিল জাপানের ট্যাকটিস্ ও টেকনিকস্। তারা সব সময় একটাই কাজ করতো আগে, আর তা হলো ঘর বাঁচানোর চেষ্টা। সে চেষ্টায় রক্ষণভাগকে সুদৃঢ় করতে গিয়ে ভাঙতো আক্রমণভাগ-মধ্যমাঠের দেয়াল। ট্রুসিয়ের এসে ভাঙলেন সে ঐতিহ্য। আনলেন আক্রমণাত্মক ফুটবলের নান্দনিকতা। তিনি তার প্রায় ৪ বছরের সময়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন দলকে নিবিড় প্র্যাকটিস আর ট্যাকটিসের সাধনায়। 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন দলকে। বাড়ালেন খেলোয়াড়দের স্ট্যামিনা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা আর ড্রিবলিংয়ের দক্ষতা। দলকে খেলাতে শুরু করলেন এক ছন্দে। তাই এখন তারা পুরো ৯০ মিনিট খেলে এক ছন্দে। আর তা হলো রক্ষণভাগ থেকে শুরু করে তারা আক্রমণের ভিত্তি। তারপর মধ্যমাঠ, এররপর দুই উইং থেকে স্ট্রাইকারদের কাছে ডি-বক্সের কাছাকাছি জায়গায় ক্রস। আর তারপর নাকাতা-ইনামোতো'র দক্ষতার কারুকাজে লক্ষ্যভেদ। আর তার এই অল আউট পদ্ধতির খেলায় এখন সাফল্যও আসছে নিয়মিত। গোল করা বেশ ছন্দই লাভ করেছে তাদের পায়। ভেঙে গেছে আগেকার জীর্ণ মানসিকতা। ফলে এখন তারা আর গোল খেলে হতোদ্যম হয়ে পড়ে না বরং গোল দেয়ার চেষ্টায় আরো মরিয়া, আরো অ্যাটাকিং হয়ে ওঠে। যে কারণে আমরা দেখতে পেয়েছি জাপান-বেলজিয়ামের মতো অসাধারণ ম্যাচটি, যা এই বিশ্বকাপের প্রথম নান্দনিক খেলা। যাতে ছিল দু'দলের খেলোয়াড়দেরই অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন। তারপর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের প্রথম জয় ইনামোতোর গোলে। সে ম্যাচে ইনামোতো, শিনজি ওনো আর নাকাতাদের অসাধারণ অলরাউন্ড পারফরমেন্সের দ্যুতি কি ল্যাটিন ছন্দকেই চিনিয়ে দেয় না এশিয়ান ভার্সনে? আর তিউনিসিয়া তো এশিয়ার নব উত্থানের ধারায় বিব্রত, বিরক্ত বা ভীত যেটাই হোক না কেন, তা হয়ে রীতিমতো আত্মসমর্পণই করলো জাপানের কাছে।

এবারের বিশ্বকাপের মধ্য দিয়ে 'লাল প্রেতাত্মা' বা 'রেড ডেভিল'দের তালিকায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বেলজিয়ামের পর আরো যে ফুটবল দলটি যুক্ত হলো তারা হলো দ. কোরিয়া। এশিয়ার সবচে' পুরনো দল তারা বিশ্বকাপে। ১৯৪৮ সালে ফিফার সদস্যপদ পেলো। '৫৪তেই গেল বিশ্বকাপে। কিন্তু সাফল্যের পাল্লাটা একেবারেই ফাঁকা। পুরো ৫ আসরে পাক্কা ১৪ ম্যাচে জয় শূন্য, ড্র ৪ আর হার ১০। গোল দিয়েছে ১১টি আর খেয়েছে প্রায় ৪ গুণ ৪৩টি। অভিষেক ম্যাচেই তারা ককসিস, পুসকাসদের হাঙ্গেরির কাছে গোল খেয়েছিল ৯টি, দ্বিতীয় ম্যাচে তুরস্কের কাছে ৭টি। ফলে এশিয়ান কাপের '৫৬, '৬০-এর চ্যাম্পিয়ন আর '৭২, '৮৮-র রানার্সআপরা চিরকালই ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি বলে খ্যাত। কিন্তু এবারের বিশ্বকাপে তাদের খেলা সত্যিই পাল্টে দিয়েছে অতীতের কষ্টকর হিসাব। পুরো ৫ আসরে একটা ম্যাচ জিততে না পারলেও তাদের আপন রক্তে বৈরী প্রতিবেশী দল উত্তর কোরিয়া কিন্তু একবারই ১৯৬৬তে চান্স পেয়েই বাজিমাত করেছিল। রাশিয়ার কাছে পরাজয়, চিলির সঙ্গে ড্র, আর ইটালির সঙ্গে জয় তাদের তুলে দিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে।

তবে সত্যিই এবার হিসাব পাল্টে দিয়েছে দ. কোরিয়া। তার কারণ অবশ্য তাদের কোচ ডাচ্ নাগরিক গাস হিডিঙ্ক। অবশ্য গত বিশ্বকাপের পর বিশ্বকাপ জয়ী দল ফ্রান্সের কোচকেই

চেয়েছিল কোরিয়ান ফেডারেশন। কিন্তু আইমে জ্যাক সাড়া দেননি। আসেন হিডিঙ্ক। আর এসেই খোলনলচে পাল্টে ফেলেন দলের। দলের পুরনো মরচেপড়া ৩-৫-২ ফরম্যাট ভেঙেচুড়ে শুরু করেন ৪-৩-৩, ৩-৪-৩ বা ৪-৪-২ ফরম্যাটে দলকে খেলানো। আর ফল নান্দনিক খেলা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ছন্দে খেলে এখন কোরিয়া। শুরু থেকেই তারা আক্রমণাত্মক, শেষটাও করে আক্রমণ করে। তবে পুরো সময়ই কিন্তু দল এক ছাঁচে থাকে। কখনোই দুর্বল হয় না রক্ষণ কিংবা মধ্যমাঠ। আর এটাই ডাচ্ ফুটবলের শৈল্পিক ছন্দ যার প্রচলিত নাম 'টোটাল ফুটবল'। জোহান ক্রুয়েফের সৃষ্টি করা সেই মতের পথানুসারী হল্যান্ড এ বিশ্বকাপে না খেললেও তাদের খেলার ছন্দ ঠিকই পাওয়া যায় প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ের দেশটির ফুটবলের সৌন্দর্যে। আর এই 'ঘর গুছিয়ে পরের ঘরে হানা দেয়া'র পদ্ধতি অনুযায়ী কিন্তু দারুণ খেলছে কোরিয়া।

চা বামকুন, হুহু জুংমু, আন জুং হোয়ান, পার্ক জি সুংদের দেশ কোরিয়া। সিউল থেকে অদূরবর্তী ইনচিওনই সেখানকার ফুটবলের আঁতুড় ঘর। জাপানের মতো সাজানো-গোছানো লীগ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আছে সেখানে, যেখানে পেশাদারিত্ব পেয়েছে কোরিয়ান উৎকর্ষ। সঙ্গে আছে তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বানানোর জন্য যথেষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যার দায়িত্বে আছেন বর্ষীয়ান সংগঠকরা।

এমনই এক ঘরোয়া ফুটবল কাঠামোর ওপরে দাঁড়িয়ে দ. কোরিয়ার জাতীয় দলের কোচ হিডিঙ্ক দলকে তৈরি করেছেন পেশাদারিত্বের পূর্ণ ছাঁচে। তার দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই খেলেন ইউরোপীয় ফুটবলে। ফলে ইউরোপীয় ফুটবলের কানাগলি সম্পর্কে ভালোই অবগত কোরিয়ান দল। যার ফল দেখা যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে কোরিয়ার কাছে গ্রুপ ডি'র দু'টি ইউরোপিয়ান দলের করুণ পরাজয়, যার মধ্যে অন্যতম পর্তুগাল। পোল্যান্ডকে তারা হারায় পরিষ্কার ২-০ ব্যবধানে। অবশ্য এর পূর্বাভাসও মিলেছিল বিশ্বকাপ পূর্ববর্তী প্রদর্শনী ম্যাচগুলোতে। সেখানে ইটালির সঙ্গে তাদের জয় আর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসাধারণ পারফরমেন্স বুঝিয়ে দিয়েছিল কেমন দল এবারের দ. কোরিয়া। তারা আসলেই যে অমন ভালো দল তার প্রমাণ পর্তুগালের সঙ্গে তাদের ম্যাচ। যদিও সে ম্যাচে দুই খেলোয়াড়কে হারিয়ে সমস্যাই হয়েছিল পর্তুগালের, তারপরও প্রতিপক্ষের মুহুর্মুহু আক্রমণের মুখে তাদের অনড় রক্ষণভাগ এবং সেই সঙ্গে চান্স পেলেই আক্রমণ শানিয়ে পর্তুগালের ডিফেন্সকে নড়িয়ে দেয়া এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১-০ গোলে ম্যাচ জয় পার্ক জি সুংয়ের অসাধারণ গোলে— এসবই প্রমাণ করে দ. কোরিয়ার সামর্থ্য। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের অবস্থাটা একটু করুণই ছিল, তবু খুব একটা খারাপ নয় ফিনিশিংয়ের সমস্যাটি ছাড়া। যেটা তারা পরবর্তীতে খানিকটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

তবে এশিয়ার অন্য দুটো দলের অবস্থা এবার বেশ করুণ, বলা যায় অসহায়ই ছিল। এশিয়ান কাপের '৮৪ সালের রানার্সআপ চীনের দীর্ঘ ৪৪ বছরের সাধনা আর অপেক্ষার সমাপ্তিতে তারা বর্ষীয়ান কোচ বোরা মিলুটিনোভিচের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা আর ট্যাকটিসের প্রাচুর্যে এবার আসে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীনের অভিষেক ম্যাচ ছিল কোস্টারিকার সঙ্গে। সেখানে তারা মোটামুটি ভালো খেললেও পরাজিত হয় অভিজ্ঞতার কাছে আর শক্তির সামর্থ্যে, স্কিলের দুর্বলতায়। ফল ২-০ গোলে পরাজয়। তারপর ব্রাজিলের সঙ্গে খেলায় প্রকটভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা এখনো ফুটবলে দুগ্ধপোষ্য শিশু। তারা বেশ ক'বার ব্রাজিলের দুর্বল রক্ষণভাগে হানা দেবার সুসাহস দেখাবার মতো দুঃসাহস করলেও পরিণতিতে কিছুই আসেনি, শুধু অভিজ্ঞতা ছাড়া। আর তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্ষণে ক্ষণে কিছু সুন্দর খেলার নমুনা দেখালেও ফল বেশ খারাপই হয়েছে, ৩-০ গোলে পরাজয়। তারপরও বলা যায়, প্রথম বিশ্বকাপে ৯ গোল খেয়েও তাদের অভিষেকটা নিদারুণ মন্দ হয়নি, কারণ কোনো ম্যাচেই খেলার শুরুতেই তারা অন্তত খেলা ছেড়ে দেয়নি।

অবশ্য চীনের-ই বা কি দোষ! তাদের চেয়ে পুরো দু'আসর আগে বিশ্বকাপে অভিষিক্ত সৌদিদের তৃতীয় বিশ্বকাপ জয় রাইডের পারফরমেন্স দেখলে সে কথা বলাই যেতে পারে। '৯৪-এর বিশ্বকাপে মরক্কোকে ২-১ গোলে আর বেলজিয়ামকে সাঈদ ওয়াইরানের করা এক দুর্ধর্ষ গোলে পরাজিত করে দ্বিতীয় পর্বে ওঠা সৌদিরা এবার দেখায় জঘন্যতম পারফরমেন্স। জার্মানির কাছে তারা হারে পুরো ৮-০ ব্যবধানে, আয়ারল্যান্ডের কাছে ১-০তে আর ক্যামেরুনের কাছে ৩-০তে।

গত দুই বিশ্বকাপের ৭ ম্যাচে ৭ গোল দেয়া ও ১৩ গোল খাওয়া সৌদিরা এই এক বিশ্বকাপেই খায় পুরো এক ডজন গোল আর দেয় ঠিক শূন্যটি। অবশ্য বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সই যেখানে গোল দিতে ব্যর্থ, সেখানে সৌদি আর চীন বলতেই পারে যে এখন তারা ফ্রান্সের সমকক্ষ। অবশ্য সে দাবির আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এক প্যাঁচ কিন্তু থাকবেই। তবে সবচে' আশ্চর্যের বিষয়, এবার পেট্রোডলারের দেশটির কোচ চিন্তা। সামি আল জাবেরের দলকে কিভাবে তাদের মতো একটি ভগ্ন অতীত ফুটবল ইতিহাসের দেশ নাসের আল জোহারের মতো স্বদেশী কোচের ওপর ভরসা রাখল তা সত্যিই অবাক করার মতো ঘটনাই বটে।

এবারের বিশ্বকাপে অন্যতম দর্শনীয় গোল দিয়েছেন পার্ক

তবে সব সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার ভিড় থেকে বলা যায়, এবারের বিশ্বকাপটি নিঃসন্দেহে এশিয়ানদের ভালো-মন্দের মিশ্রণে অপূর্ব হয়ে থাকবে। কারণ সত্যিই ভয় ছিল জাপান-কোরিয়াকে নিয়ে। যেখানে ইতিপূর্বে কোনো স্বাগতিক দলেরই দ্বিতীয় পর্বের আগে বাদ পড়ার ঘটনা ঘটেনি, সেখানে তারাও কি পারবে না ঐতিহ্য রক্ষা করতে। বিশেষ করে সৌদি-চীনের দুরবস্থা সে ভয়কে আরো বাড়িয়েই দেয়। তারপরও দু'দেশের সমর্থকদের অক্লান্ত সমর্থন তাদেরকে প্রেরণা যোগায় স্বাগতিকের মান রাখতে। এবার দ্বিতীয় রাউন্ডে জাপানের খেলা তুরস্কের সঙ্গে, যেখানে তাদের জয়ের সম্ভাবনা বেশ ভালো। তবে সময়ই বলবে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে কিনা। একই কথা প্রযোজ্য কোরিয়ার বেলায়ও। ইটালির রক্ষণদুর্গ ভেঙে জয়ের সোনালি হাসি দেখতে তারা পারবে কি না। তবে যাই হোক, সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের উত্থান আর সেই জাপানিদের শোষিত দেশ কোরিয়ার উত্থান যে ফুটবলের বর্তমান ম্যাপে এশিয়ার মানটাকে আরো অনেকখানি সুসংহত করলো তাতে কোনো সন্দেহ আছে কী? বাংলাদেশও কী একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি— স্বাগতিক হয়ে যদি অধরা স্বপ্নটাকে একটু ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা যেত? যা হোক চিন্তা নেই, সাদা-লালের দেশ বিশ্বকাপে না থাকুক, সাদা-লাল-নীলের দেশরা তো আছে। ওদের ওপরই আপাতত ভরসা করি আমরা।